13 x 22 inch

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই দিনে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সাতজন বীরশ্রেষ্ঠসহ সশস্ত্র বাহিনীর সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বগাথা জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত পাল্টা আক্রমণ চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর এই সম্মিলিত লড়াই দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর যে কোনো আক্রমণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধে আমাদের সাহস ও প্রেরণা যোগায়।

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্ব ও আস্থার প্রতীক। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্যোগ ও জাতীয় সংকট মোকাবিলা এবং জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সশস্ত্র বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ দুর্যোগ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্রম জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়া, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে। আমি বিশ্বাস করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ সর্বদা রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে নিজেদের গৌরব সমুন্নত রাখবেন।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনীঃ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' এর নামে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও দমন-পীড়ন শুরু করলে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সদস্যরা সর্বত্র দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাঁচটি ব্যাটালিয়নসহ অন্যান্য সেনাসদস্যরাও সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। চট্টগ্রামে ৮ ইস্ট বেঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪ ইস্ট বেঙ্গল, যশোরে ১ ইস্ট বেঙ্গল, জয়দেবপুরে ২ ইস্ট বেঙ্গল ও সৈয়দপুরে ৩ ইস্ট বেঙ্গল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই প্রতিরোধই মহান মুক্তি সংগ্রামের পথে প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ ছিলো। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণের পর কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) এম. এ. জি. ওসমানীকে কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে বাংলাদেশ ফোর্সেসের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। একই সঙ্গে দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ভূখন্ডকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরও তিনটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয় এবং গোলন্দাজ সহায়তা প্রদানের জন্য দুইটি আর্টিলারি ও একটি স্বতন্ত্র রকেট ব্যাটারি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়কে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে গড়ে তোলা হয় তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড-জেড ফোর্স, এস ফোর্স এবং কে ফোর্স। পাশাপাশি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডাইরেক্টরেট অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস'। সেনাবাহিনীর এই সংগঠিত ও পরিকল্পিত অংশগ্রহণের ফলে মুক্তিযুদ্ধে নতুন গতি ও দিকনির্দেশনা যুক্ত হয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৫ জন অফিসারসহ মোট ১,৪৬০ জন বীর সেনাসদস্য চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সেনাবাহিনীর ০৩ জন সদস্যকে বীরশ্রেষ্ঠ, ৩৯ জন সদস্যকে বীর উত্তম, ৯০ জন সদস্যকে বীর বিক্রম এবং ১৬৭ জন সদস্যকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়।

নৌবাহিনীঃ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবিস্মরণীয় ভূমিকা চূড়ান্ত বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তৎকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও নাবিক পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই সময় ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি সাবমেরিনার নিজ দেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে সংগঠিত হয় এবং তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলে একটি দুর্ধর্ষ নৌ কমান্ডো দল। অকুতোভয় এ সকল নির্ভীক তরুণ নৌ কমান্ডোগণ দেশের প্রধান নদী বন্দরগুলোতে দুঃসাহসী 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করে রসদ বোঝাই প্রায় ২৬টি শত্রু জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এছাড়াও ৪৯ জন নাবিক ও ০২টি গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নিয়ে খুলনার পশুর নদীতে 'অপারেশন হটপ্যান্ট' এর মাধ্যমে শত্রুদের যুদ্ধজাহাজ ও রসদবাহী জাহাজ ধ্বংস করে দিয়ে হানাদার বাহিনীর কৌশলগত সুবিধা চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। দেশ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নৌ কমান্ডোরা সারাদেশে অসংখ্য সফল অভিযান পরিচালনা করেন। নৌবাহিনীর এই দুঃসাহসিক অভিযানগুলো শত্রুপক্ষকে নৌপথে দিশেহারা করে তুলেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে বহুসংখ্যক নৌ সদস্য শাহাদত বরণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ শহিদ রুহুল আমিন, ইআরএ-১ কে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও, ০৫ জন সদস্যকে বীর উত্তম, ০৮ জন সদস্যকে বীর বিক্রম এবং ০৭ জন সদস্যকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়।

বিমান বাহিনীঃ ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে সীমিত সম্পদ, অসংখ্য সীমাবদ্ধতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যত এবং চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে 'কিলো ফ্লাইট' নামে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই দিনে একটি অটার বিমান, একটি ড্যাকোটা বিমান ও একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার এবং বাঙালি বৈমানিক, কারিগরি পেশার বিমানসেনা ও বেসামরিক বৈমানিকসহ ৫৭ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে 'কিলো ফ্লাইট'। মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার এর প্রথম অক্ষর 'কে' থেকে 'কিলো ফ্লাইট' নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে, এই 'কিলো ফ্লাইট' এর অধিনায়ক হিসেবে অপারেশন পরিচালনা করেন স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ। নবগঠিত এ বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ অপর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও তিনটি সাধারণ বিমান আর হেলিকপ্টারকে রূপান্তরিত করেন যুদ্ধবিমানে। এরপর ৩রা ডিসেম্বর মধ্যরাতে অটার বিমানের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ইস্টার্ণ রিফাইনারী এবং অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল জ্বালানি ডিপোর ওপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সফল বিমান অভিযান পরিচালনা করেন। উড্ডয়নের সাথে সম্পৃক্ত কোনো প্রকার প্রযুক্তি ছাড়াই শুধুমাত্র দিক নির্ধারক কম্পাস এবং উচ্চতামাপক যন্ত্র অলটিমিটারের সাহায্যে 'কিলো ফ্লাইট' পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ৫০টিরও অধিক সফল বিমান অভিযান পরিচালনা করে। মহান মক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১,১৩৬ জন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে 'কিলো ফ্লাইট'-এর অসামান্য অবদান ও বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ০১ জন সদস্যকে 'বীরশ্রেষ্ঠ,' ০৬ জনকে 'বীর উত্তম,' ০১ জনকে 'বীর বিক্রম' এবং ১৫ জনকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

বাণী

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫" উপলক্ষে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সকল বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাই প্রথম প্রতিরোধযুদ্ধে এগিয়ে আসেন এবং দীর্ঘদিন লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা ২১ নভেম্বর সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে অংশ নেন। হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও অস্ত্র উদ্ধারসহ সকল কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য আমি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। গত ১৫ মাসে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জনগণের সাথে একত্রে কাজ করে যাবে।

আমি "সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫" উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

বাণী

সেনাবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

'একুশে নভেম্বর' বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে ঐক্য আর ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা মুক্তিকামী আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিলো। ফলশ্রুতিতে, আমাদের চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত হয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি-বাংলাদেশ। এ কারণেই একুশে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' হিসেবে আমাদের গৌরব ও অনুপ্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। এই মহান দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশ 'বাংলাদেশ'। লাখো প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন মানচিত্র এবং লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা। প্রতি বছর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় '৭১ এর ভয়াবহ দিনগুলোতে বাঙালি জাতির নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের/ত্যাগের কথা। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের প্রিয় সশস্ত্র বাহিনীসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁরা মহান স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যুদ্ধাহত হয়েছেন। আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেই সকল বীর শহিদদের প্রতি যাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রিয় মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই মহান দিনে আমি সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিরক্ষা, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আর্তমানবতার সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে অনন্য ভূমিকা পালন করে জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় মোতায়েন হয়ে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আমাদের অকুতোভয় বীর সেনানীরা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে নিজেদের আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও উন্নত পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য ভবিষ্যতেও দেশ ও জাতির প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের সেবায় নিবেদিত থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি অবিচল আস্থা প্রদর্শন ও সেবামূলক সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদানের জন্য এই সুমহান দিনে আমি দেশের সকল নাগরিককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের সকলের গর্বের প্রাণপ্রিয় সেনাবাহিনী এখন অনেক আধুনিক ও সক্ষম এবং দেশে ও বিদেশে একটি দক্ষ, পেশাদার ও অনুকরণীয় বাহিনী হিসেবে স্বীকৃত। দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজস্ব জনবল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরেই প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে এই সুদক্ষ ও চৌকশ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 'জাতির আস্থার প্রতীক' হিসেবে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২৫' উপলক্ষে মহান এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এ প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। আমিন।

ওয়াকার-উজ-জামান
জেনারেল

বাণী

নৌবাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ নৌবাহিনী

২১ নভেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এক গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে জল, স্থল ও আকাশ পথে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ শুরু করে। সশস্ত্র বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির সেইসব বীর সন্তানদের, যাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ রুহুল আমিনসহ সশস্ত্র বাহিনীর সকল বীর শহিদদের, যাঁদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণা যোগাবে যুগ থেকে যুগান্তরে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। একইসাথে সশস্ত্র বাহিনীর সকল যুদ্ধাহত সদস্য ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সামুদ্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একুশ শতকের প্রগতিশীল বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপ্টার ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি সংযোজনের পাশাপাশি নিজস্ব সক্ষমতা অর্জনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিজস্ব প্রযুক্তির ড্রোন, জাহাজসমূহের আধুনিক ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম, যোগাযোগ সরঞ্জামাদি, সাইবার নিরাপত্তা এবং আধুনিক নৌ-প্রযুক্তি সংযোজন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ একটি সক্ষম, সুশৃঙ্খল ও মানসম্পন্ন বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় নৌবাহিনীর সদস্যরা দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় নিয়োজিত থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমুদ্রপথে মানব পাচার ও অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল হ্যান্ডলিং-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে বন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড গড়েছে, যা নৌসদস্যদের কর্মদক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। এছাড়াও, যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নৌসদস্যগণ উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনাসহ দেশে ও বিদেশে অসহায় ও দুস্থ মানুষের সহায়তায় পাশে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মিয়ানমারে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জরুরি ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা প্রেরণ করেছে। পাশাপাশি, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নৌসদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫-এ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যেভাবে তাদের অসীম সাহস ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তা নতুন প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। গৌরবময় এ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ২১ নভেম্বরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য দেশ সেবার মহান ব্রত নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন।

এম নাজমুল হাসান
এডমিরাল

বাণী

বিমান বাহিনী প্রধান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

২১শে নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। মহান মুক্তিযুদ্ধের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ দেশের আপামর জনতার সাথে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করেছিলেন। তাঁদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ফলেই অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয় এবং আমরা লাভ করি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড ও লাল-সবুজের পতাকা।

আজকের এই মহিমান্বিত দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সকল বীর সেনানীদের, যাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি আরও স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানসহ কিলো ফ্লাইটের সেই সকল অকুতোভয় সদস্যদের, যাঁদের অবদান আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলো এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলো আমাদের প্রিয় বিমান বাহিনী। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কিলো ফ্লাইটের সদস্যরা অসাধারণ বীরত্ব, দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও রণকৌশলের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর ওপর সফল আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো। তাঁদের অসামান্য অবদান বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য তথা সমগ্র বাঙালি জাতি চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে। তাঁদের রচিত বীরত্বগাথা যুগ যুগ ধরে এদেশের সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরসূরিদের যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনুপ্রাণিত করবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আজ দেশ ও জাতির অহংকার। 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' এই মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের আকাশসীমা রক্ষায় সদা প্রস্তুত ও অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের আকাশসীমার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি দেশবাসীর সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম, জরুরি অনুসন্ধান, চিকিৎসা সহায়তা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন ধরনের মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জাতি গঠন ও আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সীমিত সম্পদ আর নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গভীর দেশপ্রেম, উচ্চ পেশাদারিত্ব আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিমান বাহিনী দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিরবচ্ছিন্ন অবদানের মাধ্যমে এই বাহিনী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সীমিত জনবল ও সরঞ্জাম নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আমাদের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট- দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আধুনিকায়নের কৌশলগত গুরুত্ব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পায়নি। যার ফলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী অদ্যাবধি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে যখন একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন আন্তর্জাতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা আমাদের অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ প্রেক্ষাপট বদলেছে। পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা গোটা জাতিকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। এখন শুধু নীতিনির্ধারণী পর্যায়েই নয়, দেশের সাধারণ মানুষও একটি শক্তিশালী ও আধুনিক বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে, যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই প্রেক্ষাপটে, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অত্যাধুনিক Multi-Role Combat Aircraft (MRCA), Attack Helicopter, Medium Range Surface-to-Air Missile (MSAM) এবং Long-Range Radars অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, আকাশপথের সার্বভৌমত্ব অটুট রাখা, দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, একই সাথে শান্তিকালীন সময়ে জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান আরও জোরদার করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আসন্ন দিনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষ বাহিনী হিসেবে বিশ্বের দরবারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সশস্ত্র বাহিনী দিবস এক অবিস্মরণীয় দিন, যা আমাদের দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ঐতিহাসিক দিবসটির তাৎপর্যকে স্মরণীয় করে রাখতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আমাদের গর্বের প্রতীক, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও গৌরবময় অগ্রযাত্রা কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

হাসান মাহমুদ খাঁন
এয়ার চীফ মার্শাল

দেশমাতৃকার অমর সন্তান, তোমরা থাকবে স্মৃতিতে অম্লান

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী
হামিদুর রহমান

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ইআরএ-১
মো: রুহুল আমিন

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক
মুন্সী আব্দুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী-দেশের জন্য নিবেদিত

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী: 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা, দেশের তরে' এই অনন্য মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা। স্বাধীনতার পর শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নতুন স্থাপনা নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেনাবাহিনী দ্রুত পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন আর্মস ও সার্ভিস শাখার সূচনা হয় এবং ১০০টির অধিক ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বগুড়া, সাভার, মিরপুর, ময়মনসিংহ, দীঘিনালা, রুমা ও আলীকদমে নতুন সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেনানিবাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভবনসমূহ সংস্কারের পাশাপাশি আধুনিক ভবন নির্মাণ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন, টাঙ্গাইলে ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড এবং বরিশালের লেবুখালিতে ৭ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পদ্মা সেতুর নিরাপত্তার জন্য ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন করা হয়। এছাড়া, স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারসহ বিভিন্ন আর্মস/সার্ভিস সেন্টার ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইসঙ্গে প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড গঠন সেনাবাহিনীর সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খল, পেশাদার, দেশপ্রেমিক ও আদর্শনিষ্ঠ বাহিনী হিসেবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষায় সর্বদা প্রস্তুত।

নৌবাহিনী: 'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়'- এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব ও সুবিশাল সমুদ্রসীমার সুরক্ষায় সর্বদা নিবেদিত। সমুদ্রসীমা ও সমুদ্র সম্পদের সুরক্ষা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটি যুগোপযোগী, দক্ষ ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই থেকেই ধারাবাহিকভাবে নৌবহরে যুক্ত হয়েছে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন সক্ষমতার যুদ্ধজাহাজ-ফ্রিগেট, করভেট, ওপিভি, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার ও আধুনিক সাবমেরিন। দুঃসাহসিক নৌ কমান্ডো ও ডুবুরিদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে আরও শক্তিশালী, দক্ষ ও পেশাদার বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস্। অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এক পেশাদার ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী। এ বাহিনীর প্রযুক্তিসমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে নেভি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (ন্যাটডক) পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ডকইয়ার্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। নৌবাহিনী পরিচালিত শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডসসমূহে নিজস্ব সক্ষমতায় দেশীয় প্রযুক্তিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করা হচ্ছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত পেট্রোল ক্রাফট 'বানৌজা বিশখালী' এবং তিনটি ডাইভিং বোট গাংচিল, পানকৌড়ি ও মাছরাঙা সম্প্রতি নৌবহরে সংযুক্ত হয়েছে। নৌবাহিনীর Centre for Naval Research and Development (CNRD) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সামগ্রিক সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার সুবিশাল সমুদ্রসীমার সুরক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদা প্রস্তুত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিমান বাহিনী: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' এই গৌরবময় মূলমন্ত্র ধারণ করে অত্যন্ত সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে দেশের আকাশসীমা রক্ষায় সদা প্রস্তুত। স্বাধীনতার পরবর্তী এই বাহিনীতে যুক্ত হয় আধুনিক যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ও এয়ার ডিফেন্স রাডার, যা বিমান বাহিনীর ভিত্তি মজবুত করে। এর পর থেকে সময়ের সাথে সাথে এই বাহিনীকে পুনর্গঠন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও জনবল পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ধারাবাহিকতায় বিমান বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, প্রশিক্ষণ বিমান, জেট ট্রেইনার, কমব্যাট ট্রেইনার ও হেলিকপ্টার। এ ছাড়া দেশের আকাশ সীমায় একটি দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করতে অত্যাধুনিক রাডার, Integrated and Automated Radar Networking System এবং উন্নতমানের সিমুলেটরসহ বিভিন্ন সামরিক প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। বিমান বাহিনী নিজস্ব কারিগরি দক্ষতা ও জনবল ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো বেসিক ট্রেইনার বিমান নির্মাণে সফলতা অর্জন করে, যা প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সকল সদস্য নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার ও সামরিক সরঞ্জামের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দেশ সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী: দেশের যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন জরুরি ত্রাণ, উদ্ধার অভিযান, খাদ্য ও ত্রাণ সরবরাহ, ঔষধ বিতরণ, আবাসন, চিকিৎসা সেবাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করছে। এরই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে, গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ দ্রব্যসামগ্রী আটক, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ বিতরণ, অসহায় দরিদ্র মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ, সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, সোলার প্যানেল বিতরণ, অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে ঘর তৈরির উপকরণ বিতরণ, দুস্থ ও শিশুদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ এবং বিভিন্ন দুর্যোগে সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ মানবিক ও নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান করছে। ইন-এইড-টু সিভিল পাওয়ার এর আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার, বন্যার্ত মানুষের উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান, জনগণের জানমাল এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আহত জুলাই যোদ্ধাদের জন্য সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। জুলাই আহত যোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসা, সার্জারি ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মানবিক সহায়তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ক্যাডেট কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)'তে [illegible] শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে 'প্রয়াস' নামে বিশেষায়িত ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। [illegible] মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পদ্মা সেতুর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান এবং পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ও সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করছে সেনাবাহিনী। [illegible] ২০২৫ সালের মার্চ মাসে মিয়ানমারে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উদ্ধারকারী ও মেডিক্যাল দল প্রেরণ করা হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। বর্তমানে বাংলাদেশ অন্যতম সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

নৌবাহিনী: সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমুদ্র সম্পদ আহরণ, দুর্যোগকালীন ত্রাণ সহায়তা প্রদান, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের সুনামের সাথে অবদান রেখে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। [illegible] UNIFIL [illegible] UNMISS [illegible] Navy to Navy Staff Talk, Defence Dialogue সহ আন্তর্জাতিক মহড়া LIMA, AMAN, MILAN, CARAT, CORPAT, [illegible] Passex [illegible]

বিমান বাহিনী: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। সম্প্রতি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফেনী ও নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত আকস্মিক ও ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর [illegible] বিমান বাহিনী পরিচালিত সাতটি বিএএফ শাহীন কলেজ ও একটি বিএএফ

বিশেষ ক্রোড়পত্র
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ এবং দু'টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ৪০,০০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে এবং প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তারা সাফল্যের ধারা বজায় রাখছে। এছাড়াও 'গোল্ডেন ঈগল নার্সারি' এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আধুনিক 'ব্লু স্কাই স্কুল' দেশের শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও, আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে মহাকাশ গবেষণা, সামরিক এবং অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে দ্রুত এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবিসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সরবরাহ ও রসদ পরিবহন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' কার্যক্রমের আওতায় নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
ক্যাপ্টেন রাকিব মাহমুদ রিমন, আর্টিলারি

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দশকের মধ্যে পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানব সমাজকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণা থেকেই উদ্ভব হয় জাতিসংঘের। জাতিসংঘের ৬টি মূল অঙ্গ সংস্থা রয়েছে এবং অনেকগুলো সহযোগী সংস্থা বিশ্ব শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের এই কার্যক্রমের এক গর্বিত অংশীদার। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের প্রধান কাজ। এক দেশের সাথে অন্য দেশের বিরোধ নিরসন ও মধ্যস্থতায় জাতিসংঘ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং জাতিগত দাঙ্গা মোকাবিলায় এরূপ পদ্ধতি পুরোপুরি কার্যকরী নয়। সেখানে নিরাপত্তার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। সদস্য দেশগুলোর প্রেরিত সামরিক সদস্যরাই এর প্রধান শক্তি। নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের সামরিক, বেসামরিক ও আধা-সামরিক লোকজন নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে (ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ) কেন্দ্র করে প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। এর পর থেকে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করেছে। অভাবক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষকে সহায়তা করা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশের পুনর্গঠনে শান্তিরক্ষী বাহিনী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে জাতিসংঘ এ পর্যন্ত ৬৫ টি মিশন পরিচালনা করেছে এবং এর মধ্যে চলমান আছে ১৫ টি মিশন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী ১৯৮৮ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার লাভ করে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন যে কাজ করে তার মধ্যে প্রধান হলো বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর করা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন পরিচালনা করা, বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি করানো, ভূমি আইন অপসারণ করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো পুনর্গঠনে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি। জাতিসংঘের বিশ্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বরাবরই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে। সে যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিলো প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী যেমন-সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ প্রভৃতি কৃতিত্বের সাথে এই মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশি এসব বাহিনী দৃঢ় মনোবল, উন্নত শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র হলো- সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অবদান দেখলে মনে হয় সারা বিশ্বের সব দেশই যেন বাঙালি সেনাবাহিনীর নিজ দেশ। সকল দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই যেন তাদের কাজ। আর তাইতো বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অন্যতম সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা প্রেরণকারী দেশ। জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে বিভিন্ন দেশের ভিআইপি, ভিভিআইপি, সরকারি মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহন এবং সাধারণ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কাজ। বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই কাজটি দক্ষতার সাথে পালন করছে।

বিদ্যমান পক্ষসমূহের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, কোথাও শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে কিনা অথবা শান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে শান্তিরক্ষী বাহিনী। লাইবেরিয়া, লেবানন, কঙ্গো, সুদান, আইভরি কোস্ট প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছে এবং করছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে দেশে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র ও ভূমিতে পেতে রাখা মাইনসমূহ। ভূমিতে পেতে রাখা মাইনে অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও ল্যান্ড মাইন উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। প্রধানত যুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে মিশন কাজ করে। এই বাহিনীর অন্যতম কাজ হলো দ্বন্দ্ব-বিক্ষুদ্ধ, বিশৃঙ্খল অঞ্চলে শৃঙ্খলা আনয়ন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বাহিনীকে এ কাজে সহায়তা করা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা পূর্বতিমুর, কঙ্গো, সুদান, লাইব্রেরিয়া, হাইতি প্রভৃতি দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। জাতিসংঘ বাহিনী যুদ্ধরত অঞ্চলে শান্তি আনয়নে কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল গ্রুপ, দল, উপদলের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয় মিশন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করেছে। লাইব্রেরিয়ার কাউন্টির ডানকাপানসু গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী বড় ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শান্তিরক্ষী বাহিনী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নির্বাচন পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেশ সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিটগুলো কর্মরত প্রতিটি দেশের মানুষের জন্যই প্রচুর পরিমাণ ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে যায়। এছাড়াও স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কন্টিনজেন্ট। মিশনে কর্মরত বাঙালি সেনারা বিভিন্ন দেশের স্থানীয় যুব সমাজকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। শান্তিরক্ষার পাশাপাশি এরূপ কার্যক্রম স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। রাজমিস্ত্রি, ইট তৈরি, টেইলারিং, এ্যাম্ব্রয়ডারি, কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিক কাজ, কম্পিউটার, উন্নত কৃষি চাষাবাদ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে স্থানীয় যুব সমাজকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষিত দল হাতে কলমে শিক্ষা দেয়।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিয়েরালিয়ন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। লাইবেরিয়া একটি সড়কের নাম রেখেছে বাংলাদেশ স্ট্রীট। এর থেকেও বড় স্বীকৃতি ও প্রাপ্তি হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহের সাধারণ মানুষের মুখে ফুটিয়ে তোলা হাসি ও তাদের ভালোবাসা। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন যে অবদান রেখে চলছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা এবং সাফল্য আমাদেরকে গর্বিত করেছে। এ পর্যন্ত শতাধিক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী জীবন উৎসর্গ করেছে। তারপরও বাঙালিদের শৃঙ্খলাবোধ, পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতা স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এটি দেশ ও জাতির নিকট অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী: জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়নের স্তম্ভ
কমান্ডার শেখ মাহমুদ হাসান, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কেবল একটি সামরিক শক্তি হিসেবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা, দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি সুসংগঠিত এবং আধুনিক নৌবাহিনী কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকেই দেশকে রক্ষা করেনা, বরং সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল সম্পদ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যা নীরবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে দেশের অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছে। বাংলদেশের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত উপকূলীয় এলাকা এবং বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক সুবিশাল জলসীমা, নৌবাহিনীর গুরুত্বকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মৎস্য ও খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা - এই সকল ক্ষেত্রেই একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর উপস্থিতি অপরিহার্য। সময়ের সাথে সাথে এই বাহিনীর দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, যা জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবদানকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবদান এক স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। জাতির ক্রান্তিকালে নৌসেনারা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই দুঃসাহসী যোদ্ধারা নদী ও সমুদ্রপথে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে শত্রুপক্ষের রসদ সরবরাহ এবং নৌ চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। স্বাধীনতার পর একটি ক্ষুদ্র নৌবহর থেকে আজকের এই আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে উঠেছে। 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' বাস্তবায়নের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজনের ফলে এই বাহিনী আজ সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের বুকে বাংলাদেশের এক বিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল বিস্তৃত, যার আয়তন প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার। এই সুবিশাল জলরাশিতে অফুরন্ত মৎস্য সম্পদ, মূল্যবান খনিজ ভান্ডার, সম্ভাবনাময় জ্বালানি ক্ষেত্র, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক রুট এবং পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা বিদ্যমান। এই সকল সম্পদের সুরক্ষা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী ও সক্ষম নৌবাহিনী অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে এই গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। সমুদ্রসীমায় নিয়মিত টহল পরিচালনা, অবৈধ চোরাচালান রোধ, মাদক ও মানবপাচার দমন এবং জলদস্যুতা নির্মূলে নৌবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টা জাতীয় নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে। তাদের কঠোর নজরদারি এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ সমুদ্র অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক। উপকূলীয় অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা, নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভয়াবহ বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন উপকূলীয় জনপদের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে, তখন প্রথম সাড়াদানকারী বাহিনী হিসেবে নৌবাহিনীর সদস্যরা দ্রুততার সাথে উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা দুর্গম এবং পানিবন্দী এলাকায় পোঁছে অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। আহতদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং গৃহহীনদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নৌবাহিনী উপকূলের মানুষের কাছে এক আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই মানবিক সহায়তা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে নৌবাহিনীর এক দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের অবদান আজ আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিয়মিত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করেছে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে বাংলাদেশের নৌসেনারা তাদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক আচরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে আনছেন। এই শান্তিরক্ষী মিশনগুলো কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি উৎস নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে এবং আমাদের সামরিক বাহিনীকে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'নীল অর্থনীতি' এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সমুদ্রের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ, মূল্যবান খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন এবং বায়ু ও সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, সমুদ্রপথে নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিত করা, দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরগুলোর নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে নৌবাহিনী দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে। সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানোর জন্য নৌবাহিনী নিয়মিত গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে এক বিশেষ অবদান রাখছে। নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ, বিএন স্কুল এন্ড কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল নৌসদস্যদের পরিবারের সন্তানদের জন্যই নয়, বরং স্থানীয় জনগণের জন্যও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করছে। এর পাশাপাশি নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দক্ষ জনবল তৈরি করে দেশের বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উপকূলীয় অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এবং দক্ষ কর্মশক্তি তৈরিতে এসব প্রতিষ্ঠান অনন্য অবদান রাখছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অংশগ্রহণ গত এক দশকে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কক্সবাজারের সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানৌজা পেকুয়া' এবং দক্ষিণাঞ্চলে নবনির্মিত 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়া, সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প যেমন: ব্রিজ, রাস্তা, খাল খনন এবং জেটি নির্মাণেও নৌবাহিনী সফলভাবে অংশগ্রহণ করছে। খুলনা শীপইয়ার্ড লিঃ এবং ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, নারায়ণগঞ্জ এর আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিজস্ব যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে, যা আত্মনির্ভরশীলতার পথে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই সক্ষমতা দেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং বৈদেশিক নির্ভরতা কমিয়ে এনেছে।

প্রযুক্তি ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রগতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রশংসার যোগ্য। সাবমেরিন সংযোজন, অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার এবং ড্রোন যুক্ত করার মাধ্যমে বাহিনীটির যুদ্ধ ও গোয়েন্দা সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া, নৌবাহিনী সাইবার নিরাপত্তা জোরদারকরণ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারনেস উন্নয়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করছে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নৌবাহিনীর কার্যকারিতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সামরিক কূটনীতি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশসহ বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিয়মিত যৌথ মহড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ভ্রমণের মাধ্যমে পেশাদার সম্পর্ক উন্নয়ন করছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান আরও দৃঢ় হচ্ছে এবং বহুপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতা গড়ে ওঠছে। এই সহযোগিতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নত করতে সহায়ক। পরিশেষে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী কেবল একটি সুসজ্জিত প্রতিরক্ষা বাহিনীই নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের এক নীরব কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর অংশীদার। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় এই বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে- এটাই জাতির প্রত্যাশা। এই বাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টা এবং দেশপ্রেম বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করবে।

সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
স্কোয়াড্রন লীডার মুহাম্মদ মাসুদ রানা, শিক্ষা

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিমান বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সামান্য কিছু সামরিক সরঞ্জাম, একটি অটার ও একটি ড্যাকোটা বিমান এবং একটি এ্যালুয়েট হেলিকপ্টার নিয়ে গঠিত এই বাহিনীটি ছিল অদম্য সাহসিকতার প্রতীক। যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ ফোর্সেস-এর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করীম খন্দকার বিমান বাহিনী গঠনের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাঙালি বৈমানিক ও টেকনিশিয়ানরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকটি পুরনো বিমান ও হেলিকপ্টারকে সামরিক কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। আর এর মাধ্যমেই ১৯৭১ সালের ০৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে, কিলো ফ্লাইটের সদস্যরা সফলভাবে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি এবং নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেলের ডিপোতে দুঃসাহসিক বিমান আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিলো ফ্লাইট ৩রা ডিসেম্বর মধ্যরাতের অত্যন্ত সফল এয়ার অপারেশনের পর ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অটার বিমান এবং এ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিমান অভিযান সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে। 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য সদা প্রস্তুত থাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃপ্ত শপথে। উপরন্তু জাতীয় উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক শান্তি কার্যক্রমে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। দেশের আকাশসীমার নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব। তাই সময়ের পরিক্রমায় বিমান বাহিনীতে সময়োপযোগী বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, রাডার, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র, ইউএভি, টার্গেট ড্রোন, জিপিএস লেজার নির্দেশিত বোম্ব এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিমান বাহিনী অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, রাডার সিস্টেম এবং বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের এয়ার ডিফেন্স আইডেন্টিফিকেশন জোন (এডিআইজেড)-এর সার্বক্ষণিক নজরদারি ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করে। এটি যেকোনো ধরনের অননুমোদিত অনুপ্রবেশ বা আকাশসীমা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। তাছাড়া দেশের আকাশসীমার প্রতিরক্ষা নজরদারি অধিকতর জোরদার করণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ফ্রান্সের তৈরি দুটি জিএম-৪০৩এম মডেলের রাডার স্থাপন করা হয়েছে। সদ্য স্থাপিত এই রাডারগুলোর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে নজরদারি করা সম্ভব। এছাড়াও, ভূপৃষ্ঠ হতে নিম্ন উচ্চতায় উড্ডয়নরত লক্ষ্যবস্তুকে চিহ্নিত করতে অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে স্থাপন করা হয়েছে মোবাইল গ্যাপ ফিলার রাডার।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিরলসভাবে নিয়োজিত। স্থল ও নৌ পথে যেখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব, সেখানে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছায়। দেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যার সময়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, হতাহতদের সরিয়ে নেওয়া, মেডিক্যাল ক্যাম্পিং ও জরুরি চিকিৎসা সহায়তা এবং অসহায় মানুষদের ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে দিনরাত জরুরি পরিষেবা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যগণ অগ্নি নির্বাপণে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে জনসাধারণের জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়াও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে ঢাকা শহরের ৯টি সেক্টরের মধ্যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের দায়িত্ব বিমান বাহিনীর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বসের মতো পরিস্থিতিতে দুর্গম ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুততম উপায়ে ত্রাণসামগ্রী, ঔষধপত্র এবং জরুরি উদ্ধারকারী দল পৌঁছানোর একমাত্র কার্যকর মাধ্যম হলো বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। সম্প্রতি, চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ অবস্থিত ইউনিট এক্সেসরিজ লিমিটেড, কর্ণফুলী ইপিজেড-এ অবস্থিত জান্ট এক্সেসরিজ লিমিটেড নামক কারখানা এবং মহাখালী ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ ফিলিং স্টেশন-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটলে বিমান বাহিনীর সদস্যগণ অগ্নি নির্বাপণে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিমান বাহিনী দ্রুততার সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য হেলিকপ্টার দিয়ে এয়ার লিফটিং এবং সামরিক বিমান ব্যবহার করে হাজার হাজার টন ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে। এটি শুধু জীবন রক্ষায় নয়, বরং জাতি গঠনে সামরিক বাহিনীর জনকল্যাণমুখী ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, ধর্মীয় উপাসনালয় ও রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৯৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যরা শান্তিরক্ষা মিশনের আওতায় ইউরোপের বসনিয়া-হার্জেগোভিনা গমন করেন। তারপর থেকে থেমে নেই তাদের শান্তির অন্বেষণে অগ্রযাত্রা। বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোতে একটি ইউটিলিটি এভিয়েশন ইউনিট এবং একটি এভিয়েশন ট্রান্সপোর্ট ইউনিট অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে নাইট ভিশন প্রযুক্তিসহ এমআই-১৭১এসএইচ হেলিকপ্টার অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিমান বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা তাদের উচ্চমানের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। তাদের পেশাগত অবদানের পাশাপাশি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতার আওতায় দরিদ্র মানুষকে কারিগরি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তিরক্ষীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক সহায়তা, সৈন্য পরিবহন, ত্রাণ সরবরাহ ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছানোর কাজ বিমান বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা, আহত শান্তিরক্ষীদের দ্রুত স্থানান্তর এবং এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদানে বাংলাদেশি বৈমানিক ও প্রকৌশলীরা সুনাম অর্জন করেছেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুরস্ক ও সিরিয়ায় সংঘটিত শক্তিশালী ভূমিকম্প এবং লিবিয়ায় ঘূর্ণিঝড় ও ভয়াবহ বন্যার পর দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানের মাধ্যমে মানবিক সহায়তাসহ উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি মিয়ানমার এবং আফগানিস্তানে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০জে পরিবহন বিমানের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে মানবিক সহায়তা প্রেরণ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে। অতি সম্প্রতি নেপালে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে আটকে পড়া বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে সি-১৩০বি পরিবহন বিমানের বিশেষ ফ্লাইটের মাধ্যমে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। দেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে (সিএএবি) প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তা বিষয়ক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বিমান বাহিনীর সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিমানবন্দর সমূহের সকল ফ্লাইট চলাচলের সার্বিক কার্যক্রম স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি বিমানবন্দর ও তদসংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে বদলে দিয়েছে সম্পূর্ণ বিমানবন্দরের সেবাকার্যক্রমের দৃশ্যপট যা দেশের সর্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত।

একটি স্বনির্ভর ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনবলের মাধ্যমে যুদ্ধবিমান, প্রশিক্ষণ বিমান, হেলিকপ্টার, রাডার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ সফল ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওভারহোলিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব জনবল ও কারিগরি দক্ষতায় প্রথমবারের মতো তৈরি করা হয়েছে দু'টি বেসিক ট্রেইনার প্রশিক্ষণ বিমান। সম্প্রতি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার, ডিজিটাল সিমুলেটর যা, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং-এ যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আকাশসীমার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে এবং শান্তিকালীন সময়ে জাতীয় উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় অবদান রেখে চলেছে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিতরূপ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতীক। নীতি, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের ধারায় অবিচল থেকে দেশ ও জাতির নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় যেকোনো দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত।